International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.66-78
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.66-78

কুমার অজিত দত্তের 'দিখৌ নদীর কূলে': শিল্প-সার্থকতার নিরিখে

ড. বরুণ কুমার সাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abstract:
Based on the Ahom king Chaolung Sukapha, the Bengali Novel 'Dikhou Nadir Kule' authored by Kumar Ajit Dutta is one of the pioneer attempts to present historical narratives in Bengali Literature of North East India. In this novel, the author has beautifully portrayed the character of Sukapha, the founder king of the Ahom dynasty. From great Patkai hills, Sukhapha set out his journey in 1228 and finally established the Ahom Kingdom in Assam. The author has designed some factious characters and delineated incidents with a view to establishing this work as a historical novel. This study intends to make a descriptive study on historical, stylistic and literary aspects prevailing in this novel.

Key Words: Ahom kingdom, Chaolung Sukapha, Historical Novel, Dikhou Nadir Kule

উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক কুমার অজিত দত্তের একটি ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস 'দিখৌ নদীর কূলে'। প্রসিদ্ধ আহোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চুকাফাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিজয়গাথাকে এই উপন্যাসে অভিনব উপায়ে চিত্রিত করার প্রয়াস করেছেন লেখক। উল্লেখ্য, চুকাফাকে নিয়ে অসমিয়া সাহিত্যেও সেভাবে উপন্যাস লেখা হয়নি,[1] অথচ অজিতবাবু এই অধরা বিষয়টি বেছে নেওয়া এবং বাংলায় সেটা সাহিত্যরূপ দেওয়া অবশ্যই সমালোচক-চিত্তে কৌতূহল জাগায়। এই ঐতিহাসিক বিষয়-নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন— 'চুকাফাকে হিরো মনে হয়েছে তাই লিখেছি।'[2] অতএব এই আলোচনায় আমরা উপন্যাসে প্রতিফলিত ঐতিহাসিকতা, লেখকের স্বকীয়তা, রচনাশৈলী এবং শিল্প সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করব।

'দিখৌ নদীর কূলে' উপন্যাসটি ২০১৩ সালে প্রথম 'মুখাবয়ব' পত্রিকার বিশেষ উপন্যাস-সংখ্যার ১ম পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। শুরুতে উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছিল 'প্রথম আলোয়'। পরবর্তীকালে সেটা পাল্টে দিয়ে নামকরণটিকে আরও ব্যঞ্জনাময় করে তোলা হয়েছে, কারণ প্রাচীন যুগে মানুষের জীবন কিংবা জনপদ নির্ভরশীল ছিল নদীকে কেন্দ্র করেই। এই নদীই মানব সভ্যতাকে যুগে যুগে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে অনেক সভ্যতা, অনেক ইতিহাস। আহোম রাজা চুকাফা তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তার ও রাজধানী স্থাপন করতে গিয়ে অনেক নদী, পাহাড়, জঙ্গল, জনপদ পেরিয়ে অবশেষে দিখৌ[3] নদীর কূলে চেরাইডয়ে[4] এসে ভিত স্থাপন করলেন। দিখৌ নদী-

তীরবর্তী এই জনপদ হয়ে উঠল আহোম সাম্রাজ্যের এক ঐতিহাসিক পীঠস্থান। সেই দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ অবশ্যই সার্থকতার দাবি রাখে। কেন চুকাফা প্রকৃত অর্থেই এক তুলনারহিত-নায়কোচিত চরিত্র সেটা বলতে গিয়ে 'আত্মপক্ষ' অংশে লেখক বলেন—

> "...সেই সুদূর ব্রহ্মদেশের (বর্তমানের মায়ানমার) 'মাউলং' দেশ থেকে এসে একটি অচেনা-অজানা পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা আদিভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলকে কবজা করে অচিরেই নায়ক হয়ে উঠলেন। এই ভাবনা থেকেই চুকাফা সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে... এবং অবশ্যই আগ্রহ বেড়েছে তাঁকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার।"[5]

এবারে আমাদের লক্ষণীয় বিষয়, লেখকের সেই অনুসন্ধিৎসার পরিণতি-স্বরূপ 'দিখৌ নদীর কূলে' উপন্যাসটি শিল্প-সার্থকতা লাভ করেছে কি না।

এই উপন্যাসের কাহিনির পরিসর হচ্ছে চুতিয়া-অধ্যুষিত পাটকাই অঞ্চলে চুকাফার প্রভাব বিস্তার ও চুতিয়া রাজকন্যা বিদ্যাধরীর (জাচিংফা) সঙ্গে বিবাহ থেকে শুরু করে চরাইদেও-এ রাজধানী স্থাপন এবং শেষে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত। তবে লেখক কাহিনিগ্রন্থনে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে কাহিনি শুরু হয়েছে মৃত্যুমুখী চুকাফার অন্তিম দৃশ্য দিয়ে। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক চলে যান আহোম যুগের একেবারে সূচনা লগ্নে। এভাবেই কাহিনি এগিয়ে যেতে থাকে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চুকাফাকর্তৃক রাজধানী-পত্তন প্রত্যক্ষ করি।

উপন্যাসের পরিসর সুবৃহৎ নয়। এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪। মৃত্যুমুখী রাজার মৈদাম[6] নির্মাণের দৃশ্য দিয়ে উপন্যাস শুরু করেছেন লেখক। চুকাফার প্রথম পত্নী জাচিংফার স্মৃতিচারণের দ্বারা চুকাফার অতীতকে তুলে ধরেছেন লেখক— '

> 'অলস পায়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলেন মহারানি জাচিংফা... আজ রাজা পাশে নেই তাঁর। রাজার বসার জায়গাটায় হালকা হাওয়া বয়ে যায়। মহারানি চারদিকে চোখ ঘোরান। চোখ আটকে যায় চেরাইডয়ের দিকে।'[7]

এখানে 'অলস পায়ে' শব্দবন্ধটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অসীম কষ্টসাধনা ও দূরদর্শিতার পরিণামস্বরূপ চুকাফার আহোম সাম্রাজ্য পত্তনের যে বীরগাথা সেটার সাক্ষী ছিলেন মহারানি জাচিংফা। লেখকের বর্ণনায়—

> 'এখান থেকে চেরাইডয় নগরীকে দেখা যায় স্পষ্ট। এই দুর্গ-নগরী রাজার নিজের হাতে গড়া। দু-চোখ জুড়িয়ে যায় মহারানি জাচিংফার। এত সুন্দর নগরী, রাজার সুন্দর মনেরই অনুবাদ যেন। গর্বে বুক ফুল ওঠে তাঁর। এ নগরী পত্তনের সময় রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো মহারানি, আমার রাজপ্রসাদটি কীভাবে সুন্দর করা যায়, ঠিক তোমারই মতো। তোমার মতো সুন্দর না-হলে ওই প্রাসাদে কী করে থাকবো বলো তো...?'[8]

চুকাফার আহোম সাম্রাজ্য-পত্তনের ঐতিহাসিকতা এবং রানি জাচিংফার প্রতি প্রেম নিবেদনের কাল্পনিক দৃশ্যের সুনিপুণ সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে লেখক প্রথম অধ্যায়েই যেন সমস্ত কাহিনির সারসংক্ষেপ পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আহোম সাম্রাজ্যের রাজধানী-পত্তনের সমস্ত কৃতিত্ব যেমন চুকাফার, ঠিক তেমনি সেই রাজধানীকে সুন্দর ও শিল্পসম্মত করে গড়ে তোলার সমস্ত কৃতিত্ব যেন লেখক দিতে চেয়েছেন তাঁর

কাল্পনিক চরিত্র জাচিংফাকে। তাই শুরুতেই জাচিংফার পরিচয় প্রদানে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন—

> 'মহারানি জাচিংফা তো নিজে চিত্রকর। বালিকাবেলায় তিনি চুতিয়ার জঙ্গলে জঙ্গলে কুড়িয়ে বেড়াতেন নানা কিসিমের বুনো ফুলের রং। আঁকতেন ওই রং দিয়ে পাহাড়-জঙ্গল আর ভৈয়ামের ছবি।'[9]

রাজবৈদ্য হেমটাং জানিয়ে গেছেন— 'রাজা আর থাকবেন না'। রাজাও বুঝতে পেরেছেন নিজের অন্তিম দশা। তাই মৈদাম নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। মাইলুং প্রদেশ থেকে আনা হচ্ছে রাজার জন্য পেড়া (শবাধার)। রানি স্থির করেছেন যে এই 'প্রেমিক রাজা' দেহ রাখলে তিনিও তাঁর সহগামিনী হবেন, তাঁর দুশ্চিন্তা— 'তিনি না-থাকলে রাজার দেখাশোনা করবে কে? তিনি যে তাঁর ধর্মপত্নী'। কখনও আবার রক্তমাংসে গড়া রানিকে সংশয়ের মধ্যেও দেখা যায়— '...কিন্তু এই সোনার দেশ, এই পাহাড়-ভৈয়াম, এই সুন্দরী নগরী আর তাঁর একমাত্র সন্তান চুতেউফা— এদের যে ছেড়ে যেতে চায় না মন।' রানি অবশেষে কী করলেন সেই উৎকণ্ঠাটুকু পাঠকের মনে জাগিয়ে সুচতুর লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যান, যেখানে পাটকাই অরণ্যে চুতিয়া রাজকন্যা বিদ্যাধরী (জাচিংফা) ও চুকাফার পূর্বরাগের দৃশ্য ঘটনাধারাকে বিষাদময়তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ঘোর রোমান্টিকতায়।

বিদ্যাধরী সখিদের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে রং সংগ্রহ করছেন এমন সময় হাতির বৃংহণ-ধ্বনি তাকে সজাগ করে তুলল। এই বৃংহণ-ধ্বনিকে আসলে চুতিয়া রাজ্যে আহোমদের আধিপত্য বিস্তারের প্রতীক হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি। স্থানীয় চুতিয়া-রাজও যে আহোমদের সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে এবং বিষয়টিকে নিয়তি বলে ভেবে নিয়ে আত্মসমর্পন করতে ইচ্ছুক সে-কথা ইতিমধ্যে বিদ্যাধরীর পিতামহারাজ ঘোষণা করে দিয়েছেন—

> 'চুটিয়া রাজ্যের উত্তর ভৈয়ামে এসে তাঁবু গেড়েছেন এক শক্তিশালী টাই-রাজা তাঁর বিশাল পাইকবাহিনী আর হাতিঘোড়ার বাহিনী নিয়ে। তিনি ঈশ্বরের বরপুত্র। ঈশ্বর তাঁকে আদেশ করেছেন চুটিয়া রাজ্য শাসনের জন্য... আমি তাঁর ভক্ত... তিনি কয়েক মাসের মধ্যে এসে হাজির হবেন রাজপ্রাসাদে, আমরা তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাব...।'[10]

বনমধ্যে বিদ্যাধরী ও চুকাফার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ-দৃশ্যটি লেখক মনের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করার ভরপুর প্রয়াস করেছেন। বিদ্যাধরীকে দেখে চুকাফার প্রথম প্রশ্ন— 'তুমি কি বনদেবী?' এবং এর উত্তরে বিদ্যাধরীর আমতা আমতা করে জবাব দেওয়া 'না-না, আমি বিদ্যাধরী'— এসবের মধ্যে লেখক পূর্বরাগের গন্ধ মিশিয়ে দিয়েছেন। এখানে চুকাফা কিন্তু ভীষণ রোমান্টিক, যেমন— 'ও তাইতো বলি, এতো সুন্দর স্বর্গের দেবীর মতো মেয়ে এখানে কোথা থেকে এলো!'; অথবা 'আমি তোমার রূপে মুগ্ধ প্রিয়ে'; কিংবা 'তোমায় আমার রানি করে নিতে চাই— তুমি রাজি আছ তো?' ইত্যাদি।

তিয়া রাজ্যের সেনাপতি রুদ্রধ্বজ কিন্তু আহোমদের বশ্যতা স্বীকারে নারাজ, এবং আমরা দেখেছি যে সে বিদ্রোহী দল গঠন করে আহোমদের ওপর হামলাও করেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। রাজকন্যা বিদ্যাধরী সেনাপতি রুদ্রধ্বজের প্রতি যে দুর্বল ছিল সেকথা লেখক আকার ইংগিতে পাঠককে বুঝিয়ে দিলেও প্রবল সম্ভাবনাময় এই বিদ্রোহী চরিত্রটিকে খুব সহজের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে লেখক নিজের কার্পণ্য অথবা আলস্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেনাপতি রুদ্রধ্বজ ও আহোমদের মধ্যে সামরিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি চুকাফা ও

রুদ্রধ্বজ এই দুই শক্তির মাঝখানে বিদ্যাধরীকে স্থাপন করে তার মানসিক দ্বন্দ্বেরও একটি সুবর্ণ সম্ভাবনা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা প্রদান করতে পারত।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা চুকাফা চুতিয়াদের আতিথ্যে প্রসন্ন হয়ে ঘোষণা করেন— 'আজ থেকে আপনি এবং আপনার চুটিয়া রাজ্য টাই-সমাজে মিশে গেল', এবং চুতিয়া রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বৃহত্তর আহোম সাম্রাজ্য গঠনের সূচনা করেন। বিবাহসূত্রে বিদ্যাধরী নতুন পরিচয় লাভ করে, আহোম-রানি; সেই সঙ্গে তার নতুন নামকরণও হয়— জাচিংফা। চুতিয়া রাজকন্যা বিদ্যাধরীর আহোম-রানি জাচিংফাতে রূপান্তর লেখকের একটি কাল্পনিক ঘটনা বটে, কিন্তু কল্পনা হলেও লেখকের প্রতিভা-বলে তা পাঠক চিত্তে সত্য হয়ে উঠেছে, কারণ— 'অবিশ্বাস্য সম্ভাব্যতার চেয়ে বিশ্বাস্যযোগ্য অসম্ভাব্যতা বেশি গ্রহণযোগ্য'[11]। বৃহত্তর আহোম সাম্রাজ্য গঠনে এই ধরণের রাজনৈতিক বিবাহ যে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল সে-কথা সর্বজন স্বীকৃত। বিচক্ষণ লেখক সেই নিরস সত্যটাতে নিজের কল্পনার রংতুলি মিশিয়ে সজীব করে তুলেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

আহোম ও চুতিয়াদের মধ্যে এই এসিমিলেশন বা বলা যায় বর্ণসংকর আহোম সাম্রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিপুল ভাবে সাহায্য করল, ফলে সেই স্থানেই রাজধানী স্থাপনের বিরোধিতা করে রাজখোয়া ডাঙরিয়া[1 2] পাঁচটি যুক্তি দেখালেন— এক— জনসংখ্যার আধিক্য যা এই পাহাড়ি অঞ্চল ধারণ করতে পারবে না, দুই— জলের অভাব, তিন— পর্যাপ্ত চাষভূমির অভাব, চার— সাপের উপদ্রপ, এবং পাঁচ— মশার উপদ্রপ। রাজখোয়ার কথা শুনে চুকাফা অন্যত্র রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এখান থেকেই শুরু হল চুকাফার নেতৃত্বে আহোম রাজত্ব-বিস্তারের বিজয়গাথা।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখছি যে রাজা অনুকূল পরিবেশে রাজধানী স্থাপনের জন্য ভিন্ন প্রান্তে যাত্রারম্ভের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাত্রাকালে জাচিংফাকে আবেগিক হয়ে উঠতে দেখি—

> 'পাটকাইয়ের এই স্বর্গীয় আভায় তিনি বড় হয়েছেন। আজ তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে... নারীদের জীবনটা বাঁধা পড়ে থাকে কোনো পুরুষের কাছে। গেল তিন বছরে এতো দ্রুত পাল্টে গেল জীবনটা তাঁর।'[13]

এই বিজয়যাত্রাকালে চুকাফাকে অনেক সমস্যা, বিপদ, বাধাবিপত্তি ও প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ছটোখাটো নাগা গ্রাম নিজের দখলে আনতে আনতে অবশেষে বিজয়যাত্রা খামজাং নদীর কূলে এসে পৌঁছায়। চুকাফার এই যাত্রা কিংবা ভৌগলিক অবস্থানগুলো দেখানোর ক্ষেত্রে লেখক কিন্তু কল্পনার আশ্রয় নেননি, বরং ইতিহাস-স্বীকৃত তথ্যগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে Sir Edward Gait- এর A History of Assam গ্রন্থটিকে তিনি বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন, যেখানে দেখানো হয়েছে—

> 'Sukapha is said to have left Maulung in A.D. 1215 … For thirteen years he wandered about the hilly country of the Patkai, making occasional raids on Naga villages, and in A.D. 1228 he arrived in Khamjang.'[14]

সেই নদী পার করে এগিয়ে যাওয়া কম দুঃসাহসিকতার কাজ নয়। যাত্রাপথ যাতে পাঠকের কাছে একঘেয়েমি বলে মনে না হয় তাই সুযোগ পেলেই লেখক অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে জাচিংফা ও চুকাফার রোমান্টিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আবার এগিয়ে গেছেন বিজয়যাত্রায়। এরপর এক

বছরের মাথায় তারা একটি সুন্দর উপত্যকায় এসে পৌঁছায়। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় নাগা হানাদারদের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ রাজার নিকট প্রত্যাহ্বান হয়ে ওঠে, এবং এই অংশে আমরা চুকাফাকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে দেখি। রাজা চুকাফার পরাক্রমী রূপ লেখক খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> 'আমাকে ওরা চেনে না, আমার শক্তিকে ওরা জানে না। আমি ঈশ্বরের বরপুত্র, রাজা চুকাফা, সবকিছু করতে পারি, দেখ রানি, তোমার রাজার কী অপার শক্তি—'।[15]

রাজা চুকাফা প্রয়োজনে যে ভয়ানক নিষ্ঠুরও হতে পারেন সেই দিকটি তুলে ধরতেও লেখক ভোলেননি। আহোম সেনারা যখন নাগা যুদ্ধবন্দীদের রাজার সম্মুখে নিয়ে এল, তখন রাজার আদেশ—

> 'এদের পরিবার-পরিজনের ওই দেহগুলো পুড়িয়েই এদের খাওয়াও, এটা আমার আদেশ, যদি না খেতে চায়, হত্যা করো এদের—'[16]

রাজার এই কাণ্ড জাচিংফাকেও বিস্মিত করেছিল। রাজার এই নৃশংসতা দেখে পণ্ডিত ডিহিঙ্গিয়া ও গাথাকার খুংলুং চুকাফার সঙ্গ ছেড়ে মাইলুং রাজ্যে ফিরে যেতে চাইলে এখানেও রাজা রুদ্ররূপ প্রদর্শন করেন এবং তাদের বন্দী করেন।

চতুর্থ অধ্যায় শুরু হয়েছে রানির ট্র্যাজেডি দিয়ে। সকল সহচরী, দাসদাসী গর্ভধারণ করছে অথচ রানির কোল শূন্য। অন্যদিকে রাজা আজকাল নর্তকীদের সঙ্গেই বেশি সময় অতিবাহিত করেন যা রানিকে মর্মাহত করেছে।

চুকাফার বিজয়রথ চলতেই থাকে। এবার তারা খামহাংপুং নামরুক (বর্তমানের নামরূপ) ইত্যাদি অঞ্চল পেরিয়ে, পথে শবরদের সঙ্গে মিত্রতা করে, চেচা নদী, দিহিং নদী, টিপম পাহাড় ইত্যাদি অঞ্চল পার করে আহোম সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তার প্রদান করতে লাগল। তবে অধ্যায়ের শেষে দেখানো হয়েছে যে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে আহোমদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করছে। রাজা সেই স্থান তাৎক্ষণিকভাবে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবার যাত্রা শুরু হল।

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজার বিজয়যাত্রা পৌঁছেছে মুন্‌কল্যাং সেক্রুতে (বর্তমানের অভয়াপুর)। কাছেই ব্রহ্মপুত্র, চমৎকার বিস্তৃত এলাকা। রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন এই অঞ্চলে কিছুকাল কাটাবেন। কিছুদিনের মধ্যেই চারদিক ফসলে ভরে উঠল। ঔপন্যাসিক শষ্য-শ্যামলা ধরিত্রীর পাশাপাশি রানি জাচিংফার গর্ভধারণের বিষয়টিকেও খুব অর্থবহভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতদিন সবকিছু আনন্দে কাটলেও কিছুদিনের মধ্যেই ভয়ানক বর্ষা ও বন্যার তাণ্ডব আবার আহোমদের জীবনে এনে দেয় চরম বপর্যয়। এই অংশে প্রজার দুঃখে দুঃখিত রাজার অন্তরের হাহাকার চুকাফা চরিত্র-চিত্রণে এক নতুন দিক উন্মোচন করে। যে রাজা শত্রুর কাছে নিষ্ঠুর, সেই রাজাই আবার প্রজার দুঃখে আত্মবিলাপ করেছেন—

> 'আমার প্রজা-পাইক-রাজন্যবর্গদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে এল, সবই আমার দোষে...'[17]

এরপর রাজার বিজয়বাহিনি হাবুং নদীর তীরে এসে পৌঁছায়। সেখানে কিছুদিন থেকে পুত্রের নামকরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত হয় ঘুড়ি উৎসব। রাজার হুংকার—

> 'সারা বিশ্ব দেখুন, আমি রাজা চুকাফা, একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট, যিনি বেরিয়েছেন বিজয়যাত্রায়। তিনি যে-যে পথ দিয়ে যাবেন তার পার্শ্ববর্তী সব গ্রাম-রাজ্য এই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করবে...।'

রাজকুমার চুতেউফাকে কেন্দ্র করে উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার শুরু হল বর্ষা। পাহাড়ি নদী হাবুং ফুঁসে উঠেছে যেন। আবার শুরু হল যাত্রা। পাহাড়-গিরিখাদ পেরিয়ে তারা নতুন নতুন জনপদে গিয়ে তারা পরীক্ষা করতে লাগলেন যে সেটা রাজধানী স্থাপকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কি না। অন্যদিকে রাজকুমার চুতেউফা এভাবেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বড় হতে লাগল। এরপর চুকাফার বিজয়বাহিনি যে স্থানে গিয়ে থামল সেই জনপদ সুন্দর শ্যামলিমায় ঘেরা হলেও সেখান থেকে আজ অবধি কর সংগ্রহ হয়নি। রাজা গুপ্তচর লাগিয়ে জানতে পারলেন যে এখানকার জনবসতি এত বেশি যে সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখাটা প্রত্যাহ্বান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজা বিস্ময়ের সঙ্গে জানালেন— 'রাজখোয়া ডাঙরিয়া, আমাদের তো এখনই সরে পড়া উচিত।' উল্লেখ্য, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে যোদ্ধা-বীর-বিচক্ষণ-উচ্চাকাঙ্ক্ষী চুকাফাকে দেখেছি বা চিনেছি, তিনি জনপদের জনসংখ্যাধিক্যের ভয়ে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করার পরিকল্পনা করবেন সেটা কেমন যেন হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

> অবশেষে চুকাফার বিজয়রথ শিমলুগুড়িতে এসে পৌঁছায়। বুঢ়াগোহাঁই আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন— 'মহারাজ, এটা হল রাজধানী স্থাপনের ক্ষেত্রে উত্তম স্থান। এত বড় উপত্যকা এই প্রথম দেখলাম।'[18]

তবে এখানেও একটা সমস্যা রয়েছে। কারণ এই অঞ্চলটি এখনো নাগা ও চুতিয়ারা ছেড়ে দেয়নি। রাজা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেন— 'সেটা দেখা যাবে, ওরা যখন কর দিচ্ছে, অধিকার করে নিতে কতক্ষণ—'।

ছয় নম্বর অধ্যায়টি বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স। এতদিন ধরে রাজার রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে বিজয়যাত্রা, সেটা সার্থক হয়ে উঠেছে শিমলুগুড়িতে এসে। তবে পার্শ্ববর্তী নামদং অঞ্চলের মরান ও বরাহি রাজ্য কিন্তু তখনও বৃহত্তর আহোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে স্বস্তির কথা এ-ই যে ওরা বিদ্রোহী নয়, বরং মাঝেমধ্যেই বনমুরগি, বন্যশুয়োর, মদ্য, নারকেল ইত্যাদি সামগ্রী রাজাকে ভেট হিসেবে পাঠায়। কিন্তু এসবে চুকাফার সন্তুষ্টি নেই। তাঁর লক্ষ্য মরান ও বরাহি রাজ্যের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। বিচক্ষণ রাজা বল প্রয়োগের পরিবর্তে কূটনৈতিকভাবে মরান ও বরাহি রাজ্যকে মিত্রশক্তি হিসেবে সামিলকরণের পরিকল্পনা করলেন এবং সেই দুই রাজাকে আমন্ত্রণ জানালেন। পরম অতিথিপরায়ণতায় আপ্লুত মরানরাজ বদৌসা ও বরাহিরাজ থাকুমথাক নিজেদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রের দুর্বলতা চুকাফার কাছে ব্যক্ত করলে চুকাফা সঙ্গে সঙ্গে সে-সব সমাধানের জন্য প্রস্তাব জানালেন এবং যাতায়াতের পথ উন্নত করার পাশাপাশি সেই দুই রাজ্যে বেজঘর (চিকিৎসালয়), গুরুগৃহ ও দেবালয় স্থাপনের আদেশ দিলেন। আহোমরাজ চুকাফার এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হয়ে সেই দুই রাজ্যের প্রজারা আহোমদের সঙ্গে আন্তরিক হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হল। শুধু প্রজাদের মধ্যে নয়, বরং মরান রাজা চুকাফাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর তিন কন্যাকে চুকাফার হাতে তুলে দিলেন। এই বিবাহ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেকথা চুকাফা ভালো করেই জানতেন এবং এই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়ে অবশেষে ঘোষণা করলেন—

> 'আজ থেকে মরাণ ও বরাহি এই দুই রাজ্যের অদৃষ্ট মিলেমিশে এক হয়ে গেল টাই-আহোম সাম্রাজ্যের অদৃষ্টের সঙ্গে।'[19]

চুকাফার পুনর্বিবাহের পর জাচিংফার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-দৃশ্যটি রূপায়নে লেখক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'এরা (তিন রানি) কারা' এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে চুকাফা সুকৌশলে উত্তর দিয়েছেন— 'মরান

রাজার উপঢৌকন'। সপত্নীজ্বালায় জর্জরিত জাচিংফার চেহেরায় শীতল ছায়া ছেয়ে গেলেও নববিবাহিতা তিন ছোটো রানির সম্মুখে কিন্তু নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাদের বরণ করেছেন তিনি। রানিরা অন্দরমহলে চলে গেলে রাজা যখন প্রশ্ন করেছে— 'প্রিয়ে, তুমি রাগ করলে?', মহারানি জাচিংফার ধমকের সুরে উত্তর— 'চুপ, কোনও কথা নয়, তুমি কি জান না মহারানিদের রাগ করতে নেই।' এই একটি কথার মধ্যে দিয়ে লেখক জাচিংফা চরিত্রটির অভিনবত্বকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। বীর-পরাক্রমী-অপ্রতিরোধ্য আহোমরাজকে প্রয়োজনে 'ধমক' পর্যন্ত দিতে পারেন তিনি। উল্লেখ্য, এই অংশ থেকেই উপন্যাসের কাহিনিতে রাজা চুকাফার প্রভাব স্তিমিত হতে থাকে এবং উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকেন মহারানি জাচিংফা। ফলে সমালোচকের মনে সহজেই প্রশ্নের উদয় হয় যে এই উপন্যাসে তাহলে কোন চরিত্রটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে, চুকাফা নাকি জাচিংফা!

এরপরই লেখক এক লাফে দশ বছর পেরিয়ে যান। ততদিনে মরান-নাগা-বরাহি-চুতিয়ারা বৃহত্তর আহোম সাম্রাজ্যে সামিল হয়ে গেছে। রাজার মনে হয়েছে এই স্থান ও সময় রাজধানী স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুকূল। তিনি সেকথা ঘোষণাও করেন এবং রাজধানীর নাম শিমলুগুড়ি পাল্টে নতুন নামকরণ করেন 'চরাইদেও'।

সপ্তম অধ্যায়ে এসে কাহিনির স্বাদ যেন একটু পাল্টে যায়। এই অংশে রাজা চুকাফা অনুপস্থিত এবং উপকাহিনিটি পরিকল্পিত হয়েছে জাচিংফা ও রাজকবি সোমডেওয়ের আন্তরিক কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে। লেখক দত্ত এই দৃশ্যটি চিত্রণে যেন নিজের কল্পনা-প্রতিভার সমস্তটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। রাজকবি সোমদেও মহারানির সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁকে কবিতা শোনাতে। কবিতার প্রতিটি ছত্রে মহারানির রূপবর্ণনা জাচিংফাকে মহারানির-দায়বদ্ধ জীবন থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্ত করে যেন রূপসী নারীতে পরিণত করেছে। জাচিংফা কবির প্রতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শঙ্কিতও হয়েছেন, কারণ রাজা যদি জানতে পারেন যে কেউ তাঁর রানির রূপ নিয়ে কাব্য লিখেছেন তবে তার পরিণতি ভয়ানক হতে পারে। তবুও রানি নিজের উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারেননি, এবং কবিকে নিভৃত সময়ে আবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জাচিংফা ও কবিকে কেন্দ্র করে কাহিনি পল্লবিত করার অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু লেখক সচেতন ভাবেই মূল কাহিনি থেকে বেশি দূর সরে আসতে চাননি। তবে এখানেও সমালোচকের মনে প্রশ্ন জাগে, যদি চুকাফা-বৃত্তান্তই এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য হয় তবে রানি ও কবিকে নিয়ে উপকাহিনিমূলক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় পরিকল্পনার আবশ্যকতা কোথায়! নাকি স্বয়ং লেখকই অজান্তে মহারানি-চরিত্রের প্রেমে পড়ে গেছেন!

পরের আট নম্বর অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজধানী শুভারম্ভের জন্য চেরাইডয় সেজে উঠেছে। শিল্পী জাচিংফা রাজধানীর সৌন্দর্যবর্ধনে যে নকশা তৈরি করেছিলেন তার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করে সকলেই অভিভূত। ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজপুত্র চুতেউফা পালন করছে রাজধর্ম। চারদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। উল্লেখ্য এই অধ্যায়টি চুকাফার পরিবর্তে জাচিংফার দৃষ্টি দিয়ে লেখক সমাপ্ত করেছেন এভাবে—

> 'মহারানি এবার আকাশের দিকে চোখ ছড়াবার অবসর পান। সব ঘুড়ির পেছনে উড়ছে টাই-সাম্রাজ্যের গৌরব। যারা এখনো টাই-সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করেনি তাদের জানানো হচ্ছে সতর্কবাণী।'[20]

নবম অধ্যায়ে লেখক ফ্ল্যাশব্যাক থেকে কাহিনিকে ফিরিয়ে এনে প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেন, যেখানে রাজার নাভিশ্বাস উঠেছে। সকলে শেষ মূহূর্তের জন্য প্রহর গুনছে। রাজমহলের বাইরে ব্যস্ত রাজপুত্র চুতেউফা ঘোড়া ছুঠিয়ে ছুটে এসেছে পিতার কাছে। অবশেষে আহোমরাজ চুকাফা সন্তানকে কাছে পেয়ে তাকে রাজা হিসেবে দায়িত্বভার অর্পণ করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন[21]। এই অধ্যায়ে লেখক এত সহজেই সমস্ত কিছু মিলিয়ে দিয়েছেন যে পাঠক রোমান্সধর্মী উপন্যাসের স্বাদ অনুভব করেন।পরের অধ্যায়ের শুরুটা লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> 'মৈদাম তৈরি সারা। ভেতরের গর্ভগৃহটি বেশ বড় করে বানানো হয়েছে। গর্ভগৃহের একপাশে রাখা হয়েছে রাজার রাজপালঙ্কটি, আরেক পাশে মহারানি ও তিন রানির পালঙ্ক...।'[22]

সেই মৈদামে রাজার পোশাক, অলংকার, অস্ত্র থেকে শুরু করে সকল আবশ্যকীয় ও আমোদমূলক সামগ্রী রাখা হয়েছে, এমনকি তামাক টানার সোনার কৌটো, রূপোর কলকে ইত্যাদিও। যেহেতু আহোমদের এই মৈদাম ইউনেস্কো[23] দ্বারা বিশ্ব-ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত পাওয়ার যোগ্য তাই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লেখক এর বর্ণনা করেছেন।

এই অংশে দেখানো হচ্ছে যে রাজার সঙ্গে জাচিংফা সহ অন্য তিন রানিও সহমরণে যাচ্ছেন এবং সঙ্গে যাচ্ছে তাদের দাসদাসীরাও। অবশ্যই বলা যায় যে এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই যে চুকাফার সঙ্গে কে বা কারা সহমরণে গিয়েছিলেন। তবে যেহেতু সে-যুগে এইধরণের প্রথা প্রচলন ছিল তাই সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই সম্ভবত লেখক সহমরণের এই দৃশ্যটি এঁকেছেন যা সহৃদয়-সমাজের[24] কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই দশম অধ্যায়ে রাজার মরদেহ সৎকারের প্রস্তুতির পাশাপাশি লেখক আরেকটি চমৎকার সংযোজন করেছেন, এবং সেটা হল সহমরণে যাওয়ার পূর্বে জাচিংফার প্রাসাদের গম্বুজ-বারান্দায় গিয়ে অন্তিমবারের জন্য নগরদর্শন এবং কবি সোমডেওয়ের সঙ্গে শেষবারের জন্য সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ। বিগত ত্রিশ বছর ধরে রানির কাছে গচ্ছিত ছিল কবির সেই কাব্যের পাণ্ডুলিপি, আজ রানি সেটা কবিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। সমালোচকের মনে আবার প্রশ্ন জাগতে পারে যে রাজার মৃত্যুর পরও জাচিংফাকে নিয়ে কল্পিত উপকাহিনির শেষাংশ সংযোজনের আবশ্যকতা লেখক কেন উপলব্ধি করলেন! লেখকের সে উপলব্ধি কি মহারানি চরিত্রটিকে আরও উদ্ভাসিত করে তোলেনি, অবশ্যই তুলেছে। আর এখানেই খুঁজে পাই ইতিহাস নয়, সাহিত্য।

উপন্যাসের শেষ অর্থাৎ একাদশ অধ্যায় আসলে বিদায় পালা। তিনরানি সহ মহারানি জাচিংফা পুত্রের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এবং পুত্রকে প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ দিয়ে মৈদামে অবস্থান করলেন। চুকাফাপুত্র আহমরাজা চুতেইফা শ্রমিকদের মৈদামের মুখটা বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেয়।

উপন্যাসটি লেখক শুরু করেছিলেন জাচিংফাকে দিয়ে, আবার শেষও করলেন জাচিংফার বর্ণনাতেই—

> 'মহারানি আবার চোখ বুজলেন। কোমরের গোপন ট্যাক থেকে বের করে আনেন একটি ছোট বিষের কৌটো... পান করে ফেলেন বিষটুকু... ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।'[25]

এই উপন্যাসটি পাঠ করার পর পাঠক মনে চুকাফার পাশাপাশি যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে সেটি হচ্ছে বিদ্যাধরী অর্থাৎ জাচিংফা। চরিত্রদুটির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল একটি ঐতিহাসিক এবং অন্যটি কাল্পনিক। লেখকের 'আত্মপক্ষ' অংশ পাঠ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্যই ছিল

চুকাফা চরিত্রের নির্মাণ, এবং সেই ঐতিসাহিক চরিত্রটিকে সাহিত্যিক রূপ দিতে গিয়ে অন্যান্য সমস্ত কাল্পনিক চরিত্র আঁকতে হয়েছে লেখককে। কিন্তু একথা অবশ্যই চোখে পড়ে যে লেখক জাচিংফা চরিত্রটিকে চিত্রিত করতে করতে লেখক নিজেই তার মায়ায় ডুবে গেছেন, তাকে দিয়েই কাহিনি শুরু করেছেন, তাকে দিয়েই শেষ করেছেন। চুতিয়া সেনাপতি রুদ্রধ্বজের প্রতি রানির পূর্বরাগ, অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদ্যাধরী থেকে আহোমরানি জাচিংফায় রূপান্তর, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, সপত্নীজ্বালায় স্বামীকে ভর্ৎসনা, সন্তানের প্রগতিতে আত্মসন্তুস্তি, কবি সোমডেওয়ের প্রতি আগ্রহ এবং সর্বশেষে রাজার সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এই সমস্ত জীবন পরিক্রমায় জাচিংফা চরিত্রটি দারুণ ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। এখানেই লেখকের সার্থকতা।

তবে রুদ্রধ্বজ, কবি সোমডেওয়ে, তিন রানি, চুতেউফা এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ এদের মধ্যে প্রবল সম্ভাবনা ছিল। উপন্যাসের শুরুতে রুদ্রধ্বজ ও চুকাফার সংঘাত চরম মাত্রা পেতে পারত। কবি সোমডেও রানিকে নিয়ে কাব্যরচনা করে তাকে শোনানোর দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছে বটে, কিন্তু এর বাইরে একবিন্দুও এগোতে পারেনি, এমনকি শেষে রানি সহমরণে যাচ্ছেন জেনেও রানিকে প্রভাবির করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। আর তিন মরান রাজ কন্যাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোবা বলেই মনে হল। এমনকি মৈদামে সহমরণে যাবার সময়েও তারা চুপচাপ বিষ খেয়ে মরে গেলেন, সামান্য আর্তনাদ করার সুযোগ পর্যন্ত দিলেন না নিষ্ঠুর লেখক।

কাহিনি বিন্যাসের দিক থেকে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি লেখক খুব সুন্দর ভাবে রূপায়ন করেছেন। তবে ক্ষুদ্র উপন্যাসটিকে আরেকটু বিস্তৃত রূপ দেওয়া যেতে পারত। কোনো কোনো অধ্যায় লেখক খুব তাড়াহুড়ো করে শেষ করেছেন, বিশেষ করে অষ্টম ও নবম অধ্যায়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে লেখক ইতিহাসের স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে নিজের কল্পমনের মাধুরী মিশিয়ে একটা সুন্দর কাহিনি রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন যা পাঠকের মনে চুকাফার প্রতি ধারণা ও আগ্রহ জাগানোর পাশাপাশি সাহিত্যরসও আস্বাদন করায়।

এবার মূল প্রশ্নটি হল, উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে লেখকের দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত, কারণ চুকাফা ও চুতেউফা ছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। তবে উপন্যাসে প্রতিফলিত প্রাকৃতিক (নদী, পাহাড় ইত্যাদি), ভৌগলিক (বিভিন্ন স্থাননাম) ও নৃতাত্ত্বিক (বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রসঙ্গ) দিকগুলো কিন্তু যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য লেখককে প্রচুর গ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি ক্ষেত্র-অধ্যয়নও করতে হয়েছে। আহোমদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোও খুব যত্ন সহকারে লেখক উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন জাগে, এটা কি ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাকি ইতিহাস-নির্ভর রোমান্সধর্মী উপন্যাস। রোমান্সের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়—

> 'গদ্য রোমান্স প্রায়শই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে— তাই সুদূর ইতিহাসের অস্পষ্ট ধূপছায়া এক রহস্যময় পরিবেশ গড়ে তোলে রোমান্সে, কখনও তাঁকে রূপকথা বলে মনে হয়।'[26]
> কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের মতে— '... বাস্তবজীবনের সঙ্গে দূর-সম্পর্কিত, কল্পনাশ্রয়ী প্রেম-বীরত্বে যে-কোনো উপাখ্যান-ই রোমান্স অভিধায় অভিহিত হয়ে থাকে।'[27]

এই দুই যুক্তির নিরিখে কিন্তু 'দিখৌ নদীর কূলে' উপন্যাসটিকে রোমান্স বলাই সঙ্গত। এছাড়াও আরও কিছু যুক্তি হতে পারে, যেমন মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মেঘনাদ কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও যেমন নায়ক রাবণ,

ঠিক তেমনি এই উপন্যাসেও চুকাফা কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও জাচিংফাকেই প্রধান চরিত্র বলে মনে হয়। এর বেশ কিছু যুক্তি পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু এটুকু বলা যায় এই উপন্যাসে চুকাফা ছাড়াও বেশ কিছু অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে, শুধু তাই নয় এমন উপকাহিনিও চিত্রিত হয়েছে যেখানে চুকাফা অস্তিত্বহীন। নবম অধ্যায়ে রাজার মৃত্যু হলেও উপন্যাস থেমে থাকেনি, বরং এর পরেও আরও দুটি অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। অতএব নায়ক বা প্রধান চরিত্র কোনটি, এ নিয়েও ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

কিন্তু তবুও বলতে হয় যে আসলে লেখকের উপন্যাস লেখার মূল উদ্দেশ্যই ছিল চুকাফা চরিত্রটিকে তুলে ধরা। উপন্যাসটি জাচিংফা চরিত্র ছাড়াও চিত্রিত করা যেতে পারত, কিন্তু চুকাফাহীন 'দিখৌ নদীর কূলে' কল্পনাতীত। লেখক যদি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গণ্ডীর মধ্যে থেকে চুকাফা চরিত্রটি পরিকল্পনা করতেন তবে সেটা নিশ্চয় ইতিহাস হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু লেখক নিজেই বলেছেন—

> 'আমি তো আর ইতিহাস লিখতে বসিনি। লিখতে বসেছি উপন্যাস... আমার এই উপন্যাস ওই mixture of fictional and historical characters- এর দিকেই এগিয়ে গেছে... বুরঞ্জিতে চুকাফার বিজয়যাত্রা এবং ওই সময়ে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ শুধু যোদ্ধা চুকাফার সঙ্গেই পরিচিত হই আমরা। তাই আমার এই উপন্যাসে চুকাফার ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক জীবন বর্ণনায় ওই fictional অর্থাৎ কল্পিত উপাদানের আশ্রয় নিতে হয়েছে।'[28]

লেখকের এই বক্তব্যই আমাদের অনেক সংশয় দূর করে দিয়েছে। আমরা সহজেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি যে চুকাফাকে নিয়ে সুলেখক কুমার অজিত দত্ত 'দিখৌ নদীর কূলে' নামক যে উপন্যাস লিখেছেন তা সাহিত্য হিসেবে সার্থক হয়ে উঠলেও, উপন্যাসটি পল্লবিত হওয়ার ক্ষেত্রে আরও অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাই উপন্যাসটিকে সারাসরি ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলাই সঙ্গত বলে মনে হয়। শেষে বলতে হয়, উপন্যাসটি পাঠ করতে গিয়ে পাঠক যদি রসাস্বাদনের কথা ভুলে কেবল ঐতিহাসিক সত্যতার বিচার করতে বসেন, তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলব—

'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন; মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।'[29]

তথ্যসূত্র:

1) এই ধারণা প্রকাশ করেছেন লেখকের এক বন্ধু যা 'দিখৌ নদীর কূলে' উপন্যাসের 'আত্মপক্ষ' অংশে লেখক জানিয়েছেন।

2) কুমার অজিত দত্ত: দিখৌ নদীর কূলে, আত্মপক্ষ, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, স্বরের আড়ালে শ্রুতি প্রকাশনী, গুয়াহাটি।
3) The Dikhow River is a left tributary of the Brahmaputra River in the Indian state of Assam. It rises in the Zunheboto district in Nagaland, flows through the Sivasagar district of Assam and joins the Brahmaputra at Dikhowmukh.
Internet Source: <https://en.bharatpedia.org/wiki/Dikhow_River>, Date: 28/10/2022
4) 4 বর্তমান চরাইদেও হিসেবে পরিচিত। ২০১৬ সালে এটা অসমের একটি জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জেলা প্রশাসনের আন্তর্জালে জেলাটিকে এভাবে উপস্থাপন করেছে— The first permanent capital of the Ahom kingdom established by the first most revered Ahom king Chao Lung Siu-Ka-Pha, Charaideo has always held a prominent place in the annals of history. The word Charaideo has been derived from three Tai Ahom words, Che-Rai-Doi. Che means City or Town, Rai means Shine or Dazzle and Doi means Hill or Mountain. In short, Charaideo means, a shining town situated on a hill top.
Internet Source: <https://charaideo.assam.gov.in/about-district/district-glance>, Date: 01/11/2022
5) কুমার অজিত দত্ত: দিখৌ নদীর কূলে, আত্মপক্ষ অংশ।
6) আহোম স্বর্গদেউ তথা আহোম রাজবংশের লোকদের আহোম পদ্ধতিতে সমাধিস্থ করা স্থান। সমাধির এই প্রথায় মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভে কাঠের ঘর তৈরি করে মৃতদেহ রাখা হয় এবং তার সঙ্গে রীতি অনুযায়ী যে-সব সামগ্রী দিতে হয় সে-সব রেখে মাটি চেপে উঁচু করে ঢিবি বানানো হয়। অতি বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৈদামের ঢিবির ওপরের অংশে ইটের ব্যবহারও দেখা যায়।
হেমকোষ : হেমচন্দ্র বরুয়া প্রণীত এবং দেবানন্দ বরুয়া সম্পাদিত, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১১৮।
7) দিখৌ নদীর কূলে, পৃষ্ঠা।
8) তদেব।
9) তদেব, পৃষ্ঠা ১০।
10) তদেব, পৃষ্ঠা।
11) শিশির কুমার দাশ (অনূদিত): কাব্যতত্ত্ব : অ্যারিস্টটল, আশা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৭২।
12) রাজখোয়া হচ্ছে আহোম-রাজ প্রদত্ত উপাধি। ডাঙরিয়া শব্দটি সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয় যার অর্থ হচ্ছে মান্য ব্যক্তি।
13) দিখৌ নদীর কূলে, পৃষ্ঠা ২২।

14) Sir Edward Gait : A History of Assam, Thacker Spink & Co (1933) P Ltd. Calcutta, Page- 78।
15) তদেব, পৃষ্ঠা ২৩।
16) তদেব।
17) তদেব, পৃষ্ঠা।
18) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩।
19) তদেব, পৃষ্ঠা ৫১।
20) তদেব, পৃষ্ঠা ৬৪।
21) ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে চুকাফা মারা যান।
22) তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭।
23) Moidamsarevaulted chamber (chow-chali), often double storied entered through an arched passage. Atop the hemispherical mud-mound layers of bricks and earth is laid, where the base of the mound is reinforced by a polygonal toe-wall and an arched gateway on the west. Eventually the mound would be covered by a layer of vegetation, reminiscent of a group of hillocks, transforming the area into an undulating landscape. Excavation shows that each vaulted chamber has a centrally raised platform where the body was laid. Several objects used by the deceased during his life, like royal insignia, objects made in wood or ivory or iron, gold pendants, ceramic ware, weapons, clothes to the extent of human beings (only from the Luk-kha-khun clan) were buried with their king.
Internet Source: <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5915/>, Date: 01/11/2022
24) হৃদয় আছে যাঁহার, অর্থাৎ শিক্ষার সৌকুমার্য ও সুরুচি এবং তাহা হইতে জাত কাব্যের সুনিপুণ বাসনা আছে যাঁহার, তিনি সহৃদয়। সমাজচিত্তের সহিত সুনিবিড় যোগ আছে যাঁহার, তিনি সামাজিক।
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত : কাব্যালোক, দে'জ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩।
25) দিখৌ নদীর কূলে, পৃষ্ঠা ৭৪।
26) অশোক কুমার মিশ্র : সাহিত্যের রূপরীতি ও কোষ, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৮, সাহিত্য সঙ্গী, পৃষ্ঠা ১৩৯।
27) কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দে'জ, পৃষ্ঠা ২৬৭।
28) আত্মপক্ষ: দিখৌ নদীর কূলে।
29) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐতিহাসিক উপন্যাস (সাহিত্য), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১৬১।